

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীগণের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাজাম মুনিরা

রোলঃ 23090120526

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীগণের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাজাম মুনিরা

রোলঃ 23090120526

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নবীগণের দাওয়াত কেমন ছিল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিরাজাম মুনিরা, আইডিঃ 23090120526 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নবীগণের দাওয়াত কেমন ছিল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sirajam Munira

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

সিরাজাম মুনিরা

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120526

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ	5
১.১ দাওয়াহ শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ	Error! Bookmark not defined.
১.২ নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ও মানবজাতির প্রতি দায়িত্ব.....	6
১.৩ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা — দাওয়াহর মূল লক্ষ্য.....	8
১.৪ নৈতিক ও+- সামাজিক সংস্কারে দাওয়াহর ভূমিকা	9
১.৫ নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীনতা ও মানবমুক্তির বার্তা.....	10
দ্বিতীয় অধ্যায়	11
নবীগণের দাওয়াহর পদ্ধতি	12
২.১ দাওয়াহর সূচনা ও ক্রমবিকাশ.....	12
২.২ প্রজ্ঞা ও কোমলতার মাধ্যমে দাওয়াহ (দাওয়াহ বিল হিকমাহ).....	13
২.৩ ধৈর্য, ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে দাওয়াহ প্রচার	14
২.৪ প্রতিকূল পরিবেশে নবীদের সহনশীলতা ও আল্লাহর উপর ভরসা.....	15
২.৫ দাওয়াহতে দয়া, ভালোবাসা ও নৈতিক আচরণের গুরুত্ব	16
তৃতীয় অধ্যায়	17
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের দাওয়াহ	18
৩.১ নবী নূহ (আ.) এর দাওয়াহ ও জাতির প্রতিক্রিয়া	18
৩.২ নবী হুদ (আ.) এর দাওয়াহর বার্তা ও জাতির প্রতিক্রিয়া	20
৩.৩ নবী সালেহ (আ.) এর দাওয়াহ ও জাতির প্রতিক্রিয়া	21
৩.৪ নবী ইবরাহিম (আ.) এর তাওহীদের আহ্বান	22
৩.৫ নবী মূসা (আ.) এর ফেরাউনের প্রতি দাওয়াহ.....	24
৩.৬ নবী ঈসা (আ.) এর দাওয়াহ ও মানবতার শিক্ষা	25
চতুর্থ অধ্যায়.....	27
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতি জীবন.....	28

৪.১ নবুওয়াতের সূচনা ও প্রথম আহ্বান	28
৪.২ গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াহ — মক্কা পর্ব	29
৪.৩ নির্যাতন, প্রতিবন্ধকতা ও রাসূল (সা.)-এর ধৈর্য	31
৪.৪ মদিনা পর্বে দাওয়াহ — রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের দিক	32
৪.৫ আন্তর্জাতিক দাওয়াহ — বিদেশি শাসকদের নিকট চিঠি পাঠানো	33
৪.৬ রাসূল (সা.)-এর দাওয়াহর নৈতিক ও আদর্শিক দিক	34
পঞ্চম অধ্যায়	36
নবীগণের দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিকূলতা	36
৫.১ শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের বাধা	36
৫.২ বিদ্বেষ, অপমান ও মানসিক নির্যাতন	37
৫.৩ শারীরিক নির্যাতন ও হত্যাচেষ্টা	38
৫.৪ পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের বিরোধিতা	38
৫.৫ সামাজিক বয়কট ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা	39
৫.৬ দাওয়াহ বিকৃত করার চেষ্টা ও মিথ্যা প্রচার	40
ষষ্ঠ অধ্যায়	41
নবীগণের দাওয়াহ থেকে আধুনিক দাওয়াহর শিক্ষা	42
৬.১ নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি	42
৬.২ আধুনিক সমাজে দাওয়াহর প্রয়োজনীয়তা	43
৬.৩ নবীদের আদর্শ অনুসারে দাওয়াহর আধুনিক কৌশল	44
৬.৪ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমভিত্তিক দাওয়াহর নতুন ধারা	45
৬.৫ নবীগণের দাওয়াহ থেকে আহরণযোগ্য নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা	46
উপসংহার	46

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরক, কুসংস্কার ও অন্যায়ের পথে প্রবৃত্ত হয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের পথনির্দেশের জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূলগণকে, যারা মানবজাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বে আহ্বান করেছেন। এ আহ্বানই মূলত দাওয়াহ — মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মিথ্যা থেকে বিরত রাখা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”

— (সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫)

এই আয়াতেই নবীগণের দাওয়াহর সারমর্ম নিহিত আছে — প্রজ্ঞা, কোমলতা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা। নবীগণ কেবল বাক্য নয়, বরং তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্ম, নৈতিকতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে দাওয়াহর বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। তাঁদের দাওয়াহর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদ — আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না — এবং মানবতার সেবা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

নবীগণের দাওয়াহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি নবী নিজ নিজ সমাজে বিভিন্ন প্রতিকূলতা, নির্যাতন ও অবজ্ঞা সহ্য করেও আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন অক্লান্তভাবে। কেউ নৌকা নির্মাণ করে শতাব্দীকাল দাওয়াহ চালিয়ে গেছেন, কেউ শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের কথা বলেছেন, আবার কেউ নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাঁদের এ ধৈর্য, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আজকের দাওয়াহর জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, বস্তুবাদ, বিভ্রান্তি ও ধর্মীয় উদাসীনতার যুগে নবীগণের দাওয়াহর পদ্ধতি ও শিক্ষা পুনরায় অধ্যয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁদের জীবন আমাদের শেখায় — দাওয়াহ কেবল বক্তৃতা নয়; এটি ভালোবাসা, ধৈর্য, জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলিত প্রকাশ।

এই থিসিসে নবীগণের দাওয়াহর উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, কুরআনে বর্ণিত উদাহরণসমূহ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতি জীবন এবং আধুনিক যুগে দাওয়াহর জন্য নবীগণের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে দাওয়াহর মৌলিক দর্শন ও বাস্তব প্রয়োগ উভয়ই নতুনভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়

নবীগণের দাওয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১.১ দাওয়াহ শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ

দাওয়াহ শব্দটি আরবি ক্রিয়া “দাওয়া” থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ — ডাকা, আহ্বান করা বা আমন্ত্রণ জানানো। ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াহ বলতে বোঝায় — মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, তাওহীদের দিকে ডাকা এবং অন্যায়, শিরক ও কুফর থেকে বিরত রাখা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”

— (সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫)

এই আয়াতে দাওয়াহর মূল দর্শন স্পষ্ট — প্রজ্ঞা, কোমলতা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন —

“আর সেই ব্যক্তির কথা কার উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে।”

— (সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত ৩৩)

অতএব, দাওয়াহ এমন একটি মহান ইবাদত যা নবীদের মূল দায়িত্ব ছিল এবং যার মাধ্যমে মানবজাতি আল্লাহর পথে ফিরে আসে ও সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.২ নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ও মানবজাতির প্রতি দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে — যেন তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, তাঁর নির্দেশ মান্য করে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে চলে। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর একত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরক, অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে, তখন আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।”

— (সূরা আদ-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

এই আয়াতে মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়েছে — আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। কিন্তু মানুষ যখন সেই উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায়, তখন আল্লাহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন যেন তারা মানুষকে পুনরায় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে।

০ নবীদের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

ক. তাওহীদের আহ্বান

নবীদের দাওয়াহর কেন্দ্রে ছিল আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা। তাঁরা সর্বপ্রথম মানুষের বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন — যেন মানুষ কেবল আল্লাহকেই উপাস্য ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করে।

“আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি—যেন তারা বলে: ‘আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাকো।’”

— (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

খ. নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার

নবীগণ শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তাঁরা সমাজে ন্যায়, সততা, দয়া, দানশীলতা ও মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে নৈতিক জাগরণ ঘটেছিল।

নবী শূ‘আয়েব (আ.) তাঁর জাতিকে ব্যবসায়ে প্রতারণা থেকে বিরত থাকার দাওয়াহ দিয়েছিলেন; নবী মূসা (আ.) ফেরাউনের জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাওয়াহ দিয়েছিলেন।

গ. মানবজাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে আহ্বান

নবীগণ মানুষকে শুধু পার্থিব নয়, বরং পরকালীন মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের দাওয়াহর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করা এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করা।

“রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে রাসূলদের পর মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অজুহাত না থাকে।”

— (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৬৫)

০ নবীদের মানবজাতির প্রতি দায়িত্ব

নবীদের দায়িত্ব ছিল শুধু বার্তা পৌঁছানো নয়; বরং তা হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ধৈর্য, এবং উদাহরণস্বরূপ জীবন দ্বারা বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা নিজেদের চরিত্র, আচরণ ও আমলের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন।

আল্লাহ বলেন —

“রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু বার্তা পৌঁছে দেওয়া।”

— (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৯৯)

তারা আহ্বান করেছেন বিনয়ের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে, জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে। নবী নূহ (আ.) বলেন —

“হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে দিনরাত আহ্বান করেছি।”

— (সূরা নূহ, আয়াত ৫)

এই দাওয়াহর ধারাবাহিকতা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগই নবীগণের প্রকৃত দায়িত্বের প্রতিফলন।

১.৩ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা — দাওয়াহর মূল লক্ষ্য

নবীগণের দাওয়াহর মূল ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে একত্বের স্বীকৃতি ও কেবল তাঁরই ইবাদত করা। তাওহীদই ইসলামের ভিত্তি এবং সকল নবী-রাসূলের দাওয়াহর মূল বার্তা।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

“তোমার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি, প্রত্যেককে এই নির্দেশই দিয়েছি যে, ‘আমিই একমাত্র ইলাহ, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।’”

— (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২৫)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত নবী একই আহ্বান নিয়ে এসেছিলেন— আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করা যাবে না। নবীগণের দাওয়াহ কোনো জাতি, ভাষা বা সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল না; বরং তারা সবাই মানবজাতিকে এক আল্লাহর দাসত্বে আহ্বান করেছেন।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা মানে শুধু মুখে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সর্বাধিপত্য স্বীকার করা—ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। নবীগণের দাওয়াহ মানুষকে শিরক, মিথ্যা উপাসনা, জুলুম ও অন্যায় থেকে মুক্ত করে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পথে নিয়ে এসেছে।

নবী ইবরাহিম (আ.) তাওহীদের প্রতীক হিসেবে তাঁর জাতিকে শিরক ত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন:

“আমি মুখ ফিরিয়েছি তাঁর দিকে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, একনিষ্ঠভাবে; এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

— (সূরা আল-আন‘আম, আয়াত ৭৯)

এভাবেই প্রতিটি নবী তাঁদের দাওয়াহর সূচনা করেছেন তাওহীদের আহ্বান দিয়ে। নবী নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), শু‘আয়েব (আ.)—সবাই তাঁদের জাতিকে প্রথমে বলেছিলেন, “হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।”

— (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫)

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই নবীগণ সমাজে ন্যায়, শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কারণ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস মানুষকে মুক্ত করে সমস্ত মিথ্যা শক্তি, ভয় ও দাসত্ব থেকে। অতএব, দাওয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে আল্লাহর একত্বের আলোয় মানুষ ও সমাজ উভয়ই আলোকিত হয়।

১.৪ নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে দাওয়াহর ভূমিকা

নবীগণের দাওয়াহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল মানবসমাজে নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধন করা। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে কেবল ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেননি, বরং ন্যায়, সততা, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি নৈতিক সমাজ গঠনের দায়িত্বও দিয়েছেন। এই কারণেই সকল নবী তাঁদের দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, জুলুম, অসত্য, মিথ্যা উপাসনা, প্রতারণা ও অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়ের মাপকাঠি প্রেরণ করেছি, যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।”

— (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ২৫)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে নবীদের দাওয়াহ কেবল তাওহীদের আহ্বানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ন্যায় ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও বটে। নবীগণ মানুষকে আল্লাহর ভয়, পরহেজগারি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা অন্যের হক আদায়, দুর্বলদের প্রতি দয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

নবী শু‘আয়েব (আ.) তাঁর জাতিকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন—

“তোমরা পরিমাপ পূর্ণ করো এবং ক্ষতিসাধনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো।”

— (সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত ১৮১-১৮২)

এভাবে নবীগণের দাওয়াহ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ পুনর্স্থাপন করেছে এবং মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রেখেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“আমি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।” (হাদীস: মুআত্তা মালিক)

এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে নবুয়তের অন্যতম লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন ও সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা। নবীগণের দাওয়াহ তাই ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়, পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবতার বিকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

অতএব, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারে নবীদের দাওয়াহর ভূমিকা ছিল মৌলিক ও সর্বজনীন—যেখানে মানুষকে কেবল আল্লাহর আনুগত্যে আহ্বানই নয়, বরং মানবসমাজকে ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১.৫ নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীনতা ও মানবমুক্তির বার্তা

নবীগণের দাওয়াহ কোনো বিশেষ জাতি, ভাষা বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি যুগে নবী প্রেরণ করেছেন মানুষকে আল্লাহর একত্বে আহ্বান জানাতে এবং পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করতে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

“কোনো জাতিই এমন ছিল না যার মাঝে একজন সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয়নি।”

— (সূরা ফাতির, আয়াত ২৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে নবুয়তের দাওয়াহ একটি সার্বজনীন ও সর্বকালীন দাওয়াহ। প্রতিটি নবী তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, অন্যায়, শিরক ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তির দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের বার্তা ছিল আল্লাহভীতি, ন্যায়, দয়া, সত্যবাদিতা ও মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক জীবনব্যবস্থা গঠন করা।

এই সার্বজনীন দাওয়াহর চূড়ান্ত রূপ ও পূর্ণতা লাভ করেছে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। তিনি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—

“আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।”

— (সূরা সাবা, আয়াত ২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহ জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। তাঁর আহ্বান ছিল আল্লাহর একত্ব, ন্যায় ও মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের আহ্বান। নবীগণের এই সার্বজনীন দাওয়াহ মানবজাতিকে আল্লাহর

দাসত্বে ফিরিয়ে আনে, অন্যায় ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, এবং আত্মিক ও সামাজিক মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

অতএব, নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীনতা কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়, বরং মানবতার মুক্তি ও ন্যায়ভিত্তিক এক শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার বার্তা—যেখানে মানুষ আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়, এবং নৈতিকতা ও ঐক্যের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীগণের দাওয়াহর পদ্ধতি

২.১ দাওয়াহর সূচনা ও ক্রমবিকাশ

দাওয়াহর সূচনা মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম থেকেই, আদম (আ.)-এর যুগ থেকে। যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন থেকেই মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য, তাওহীদের আহ্বান ও সত্য-অসত্যের পার্থক্য শেখানো শুরু হয়। আদম (আ.)-এর পর থেকে প্রতিটি নবী তাঁদের নিজ নিজ সমাজে দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“মানুষ এক সময় এক জাতি ছিল; এরপর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।”

— (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২১৩)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে দাওয়াহর ধারাটি শুরু হয়েছিল মানবজাতির একত্ব ভেঙে বিভ্রান্তির যুগে, যখন মানুষ আল্লাহর স্মৃতি ভুলে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তাঁদের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী পাঠিয়েছিলেন। নূহ (আ.) থেকে শুরু করে ইবরাহিম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.)—প্রত্যেক নবী তাঁদের জাতিকে তাওহীদ ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেছেন।

দাওয়াহর এই ধারা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। তাঁর দাওয়াহ শুধু আরব সমাজের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে দাওয়াহ শুরু হয়েছিল গোপনে—নবী ﷺ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে আহ্বান শুরু করেন, যেমন আবু বকর (রা.), খাদিজা (রা.) প্রমুখ। পরে আল্লাহর আদেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ শুরু করেন, যখন আয়াত নাজিল হয়—

“আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ করুন এবং মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাকুন।”

— (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯৪)

এইভাবে দাওয়াহ একটি সীমিত পর্যায়ে থেকে বিস্তৃত আকার ধারণ করে, মক্কা থেকে মদিনা, আরব থেকে সমগ্র বিশ্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবী ﷺ-এর মাধ্যমে দাওয়াহর ক্রমবিকাশ মানবসভ্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা ঘটায়—যেখানে দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়, বরং জ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিক সংস্কার ও মানবমুক্তির আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.২ প্রজ্ঞা ও কোমলতার মাধ্যমে দাওয়াহ (দাওয়াহ বিল হিকমাহ)

নবীগণের দাওয়াহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও কোমলতা (লিন)। তারা কখনো কঠোরতা বা রুঢ় আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করেননি; বরং জ্ঞান, যুক্তি ও ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে সত্যের দিকে ফিরিয়ে এনেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন—

“আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে, এবং তাদের সঙ্গে এমনভাবে বিতর্ক করুন যা সর্বোত্তম।”

— (সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫)

এই আয়াতে তিনটি মূল দাওয়াহ নীতি বর্ণিত হয়েছে—হিকমাহ (প্রজ্ঞা), মাওইয়াতুল হাসানাহ (সুন্দর উপদেশ) ও জিদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান (উত্তম যুক্তি)। ‘হিকমাহ’ মানে হলো সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে এবং উপযুক্ত ভাষায় দাওয়াহ প্রদান করা; ‘মাওইয়াতুল হাসানাহ’ হলো কোমল ভাষায় হৃদয়স্পর্শী উপদেশ; আর ‘জিদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান’ হলো শালীন ও যুক্তিনির্ভর সংলাপ। নবীগণের দাওয়াহে এই তিনটি উপাদান সর্বদা বিদ্যমান ছিল।

মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে যখন আল্লাহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাদেরকেও কোমলভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

“তোমরা তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো—সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।”

— (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৪৪)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ শেখান যে এমনকি অত্যাচারী ও অবিশ্বাসীরা প্রতিও দাওয়াহ প্রদানে কঠোরতা নয়, বরং কোমলতা ও ধৈর্যই কার্যকর মাধ্যম। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াহ জীবনেও এই নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাঁর শত্রুদের প্রতিও দয়া ও ধৈর্যের সাথে আহ্বান জানিয়েছেন, যেমন তায়েফবাসীদের নির্যাতনের পরও তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন।

দাওয়াহ বিল হিকমাহ মানে শুধু সুন্দরভাবে কথা বলা নয়, বরং মানুষের মানসিক অবস্থা, জ্ঞানস্তর, ও সংস্কৃতি অনুযায়ী আহ্বান করা। নবীগণ কখনো মানুষকে হঠাৎ পরিবর্তনের আহ্বান জানাননি; বরং ধীরে ধীরে, বোধগম্য ও যুক্তিসম্মত উপায়ে তাঁদেরকে সত্যের পথে এনেছেন। ফলে দাওয়াহর এই পদ্ধতি মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলেছে এবং সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে।

অতএব, প্রজ্ঞা ও কোমলতার মাধ্যমে দাওয়াহই নবুয়তের অন্যতম আদর্শ পদ্ধতি, যা আজও প্রতিটি দাঈর (দাওয়াহকারী) জন্য শিক্ষণীয় ও অনুসরণযোগ্য।

২.৩ ধৈর্য, ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে দাওয়াহ প্রচার

দাওয়াহর পথে নবীগণ সর্বদা অবিচল থেকেছেন ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে। সত্যের আহ্বান কখনোই সহজ ছিল না; বরং তা ছিল পরীক্ষা, কষ্ট ও বিরোধিতায় ভরপুর এক দীর্ঘ সংগ্রাম। তবুও নবীগণ কখনো হতাশ হননি, বরং আল্লাহর সম্ভ্রুতি ও মানবতার কল্যাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“তুমি ধৈর্য ধরো, যেমন ধৈর্য ধরেছিলেন দৃঢ়সংকল্প নবীগণ।”

— (সূরা আহকাফ, আয়াত ৩৫)

এই আয়াত নবীদের দাওয়াহ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য — **সবর (ধৈর্য)** — এর প্রতি ইঙ্গিত করে। নবী নূহ (আ.) ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে আহ্বান করেছেন, অথচ অল্পসংখ্যক মানুষই তাঁর দাওয়াহ গ্রহণ করেছিল। তবুও তিনি কখনো দায়িত্ব থেকে বিরত হননি, বরং ধৈর্যের সাথে বারবার আহ্বান করেছেন।

“হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে দিনরাত আহ্বান করেছি।”

— (সূরা নূহ, আয়াত ৫)

একইভাবে নবী মূসা (আ.) ফেরাউনের নির্যাতন ও জাতির অবাধ্যতার মধ্যেও আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। নবী ইবরাহিম (আ.) নিজের জাতি ও পিতার বিরোধিতার মুখেও তাওহীদের আহ্বান থেকে পিছিয়ে যাননি, বরং আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরও তাঁর ঈমান অটুট ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মক্কার কুরাইশদের কঠিন নির্যাতন, উপহাস ও যুদ্ধ সত্ত্বেও দাওয়াহ অব্যাহত রেখেছিলেন।

দাওয়াহর জন্য নবীগণ কেবল ধৈর্যই ধারণ করেননি, বরং নিজেদের স্বার্থ, পরিবার ও আরামের জীবন ত্যাগ করেছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ মানবতার জন্য দাওয়াহর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করে তোলেন; ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো দান আল্লাহ কাউকে দেননি।”

— (সহীহ বুখারী)

দাওয়াহর প্রকৃত সাফল্য কোনো তাৎক্ষণিক ফলাফলে নয়, বরং ধৈর্য, ত্যাগ ও অবিচল প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় — এ সত্য নবীগণের জীবন থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদের দাওয়াহর এই ধৈর্যনির্ভর ধারা দাঈদের জন্য এক চিরন্তন দিকনির্দেশনা, যা শেখায় যে আল্লাহর পথে কাজ করতে হলে কঠিনতা ও বিরোধিতার মুখেও বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অটুট রাখতে হবে।

২.৪ প্রতিকূল পরিবেশে নবীদের সহনশীলতা ও আল্লাহর উপর ভরসা

নবীগণের দাওয়াহ জীবন ছিল পরীক্ষার, কষ্টের ও প্রতিকূলতার এক দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁরা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়ে জাতির বিরোধিতা, উপহাস, নির্যাতন ও নির্বাসনের মুখোমুখি হয়েছেন। তবুও তাঁরা কখনো হতাশ হননি; বরং দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার মাধ্যমে দাওয়াহর পথ অব্যাহত রেখেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

“অতএব ধৈর্য ধরো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।”

— (সূরা আর-রুম, আয়াত ৬০)

নবী নূহ (আ.) নয় শতাধিক বছর দাওয়াহ প্রদান করেছেন, অথচ তাঁর অনুসারী ছিলেন অল্পসংখ্যক। তবুও তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করে অবিচল ছিলেন। তিনি বলেন —

“নিশ্চয়ই আমি ভরসা করেছি আল্লাহর উপর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রভু।”

— (সূরা হূদ, আয়াত ৫৬)

নবী ইবরাহিম (আ.) তাওহীদের আহ্বান করতে গিয়ে নিজ জাতি ও পিতার বিরোধিতার সম্মুখীন হন, এমনকি তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখনও বলেন —

“আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক।”

— (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩)

নবী মূসা (আ.) ফেরাউনের ভয়াবহ অত্যাচারের মুখেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাননি। লাল সাগরের তীরে তাঁর জাতি যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন —

“কখনোই না! নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।”

— (সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত ৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তীব্র প্রতিকূল পরিবেশে একই দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। তায়েফে পাথর নিক্ষেপে রক্তাক্ত অবস্থাতেও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন— যেন তাঁর শত্রুরাই একদিন হিদায়াত পায়। হিজরতের সময় গুহায় আশ্রিত অবস্থায় তিনি আবু বকর (রা.)-কে আশ্বস্ত করে বলেন —

“ভয় পেও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।”

— (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৪০)

এই সব উদাহরণ নবীগণের দাওয়াহ জীবনে সহনশীলতা ও আল্লাহর উপর ভরসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁরা কখনো নিজেদের শক্তির উপর নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করেছেন। তাঁদের এই ঈমান ও তাওয়াঙ্কুলই দাওয়াহর সাফল্যের মূল ভিত্তি।

অতএব, প্রতিকূল পরিবেশে দাঈর জন্য নবীদের জীবন এক অমূল্য শিক্ষা — যে, দাওয়াহর পথে যত বাধাই আসুক না কেন, দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা থাকলে সত্যের আহ্বান কখনো থেমে যায় না।

২.৫ দাওয়াহতে দয়া, ভালোবাসা ও নৈতিক আচরণের গুরুত্ব

দাওয়াহর সফলতা শুধু যুক্তি ও বাণীর শক্তিতে নয়, বরং দয়া, ভালোবাসা ও নৈতিক আচরণের মাধ্যমেও অর্জিত হয়। আল্লাহ তায়ালা নবী ও রাসূলদের এমনভাবে পাঠিয়েছেন যেন তাঁরা মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল হন, তাঁদের হৃদয় জয় করেন, রুঢ় আচরণে নয়। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেন —

“এটা আল্লাহর রহমতের ফল যে, আপনি তাঁদের প্রতি কোমল আচরণ করেছেন; যদি আপনি কঠোর ও হৃদয়হীন হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।”
— (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, দাওয়াহর প্রভাব মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় দয়ালু ও নম্র আচরণের মাধ্যমে। নবীগণ কখনো রুঢ় বাক্য বা জোর-জবরদস্তি ব্যবহার করেননি; বরং ধৈর্য, দয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন। নবী মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—

“তোমরা তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বল, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।”
— (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৪৪)

এমনকি একজন কঠোর শাসক ফেরাউনের প্রতিও নবীগণকে কোমল ভাষায় আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— যা দাওয়াহর কোমলতার গুরুত্বের একটি অনন্য উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াহর জীবনে ভালোবাসা ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তিনি কখনো শত্রুর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হননি; বরং ক্ষমা করেছেন, যেমন মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বলেছিলেন—

“আজ তোমাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।”
— (সহীহ বুখারী)

তাঁর এই উদারতা ও দয়াশীলতা অসংখ্য হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। দাওয়াহর আহ্বান তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তা ভালোবাসা, ধৈর্য ও নৈতিকতার আলোকে পরিচালিত হয়। কঠোরতা ও রুঢ়তা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু দয়া ও সুন্দর চরিত্র মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনে।

অতএব, দাওয়াহর প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে দাঁড়ির অন্তরের মমতা, তার মুখের কোমল ভাষা এবং চরিত্রের মহত্ত্বে। এ কারণেই নবীগণ দাওয়াহর মাধ্যমে কেবল জ্ঞান নয়, বরং ভালোবাসা ও নৈতিকতার আলোও মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করেছেন — যা চিরকালীন দাওয়াহর আদর্শ।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের দাওয়াহ

৩.১ নবী নূহ (আ.) এর দাওয়াহ ও জাতির প্রতিক্রিয়া

নবী নূহ (আ.) আল্লাহর প্রেরিত প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ রাসূলদের একজন, যাকে আল্লাহ তাঁর পথভ্রষ্ট, মূর্তিপূজায় লিপ্ত এবং নৈতিকভাবে অধঃপতিত জাতির কাছে সত্য ও সৎপথের আহ্বান জানানোর জন্য দীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর প্রেরণ করেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

“তিনি তাদের মধ্যে এক হাজার বছরের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম অবস্থান করেছিলেন।”
(সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ১৪)

এত দীর্ঘ সময় ধরে দাওয়াহ প্রদান করা তাঁর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও তাওয়াক্কুলের অনন্য প্রমাণ। তাঁর দাওয়াহর মূল বিষয় ছিল তাওহীদ—এক আল্লাহর ইবাদত এবং জাহেলিয়াত, শিরক, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন বর্জন। তিনি তাঁর জাতিকে সতর্ক করে বারবার বলেছিলেন—

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না।”
(সূরা হূদ, আয়াত ২৬)

দাওয়াহর বহুমুখী পদ্ধতি

নূহ (আ.) কেবল একধরনের পদ্ধতিতে দাওয়াহ করেননি; বরং বহুমাত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ব্যবহার করেছেন—

- গোপনে ব্যক্তিগত দাওয়াহ,
- প্রকাশ্যে সাধারণ জনগণের সামনে আহ্বান,
- দিন-রাত অবিরাম সাহস ও নিষ্ঠার সাথে দাওয়াহ,
- উপদেশ ও ভবিষ্যৎ আযাবের সতর্কবার্তা,
- আশা ও প্রতিশ্রুতি সমন্বিত আহ্বান—যেমন ক্ষমা, বরকত, বৃষ্টি, সন্তান-সম্ভাবনা ও রিজিক বৃদ্ধির সুসংবাদ।

তিনি বলেছিলেন—

“আমি আমার জাতিকে রাত-দিন আহ্বান করেছি।”
(সূরা নূহ, আয়াত ৫)

জাতির অহংকার ও শত্রুতা

নূহ (আ.) এর দাওয়াহর প্রতি তাঁর জাতির প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র বিরূপ। তারা তাঁর উপদেশকে বিদ্রূপ করত এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা করত। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—
“তারা আঙুল দিয়ে তাদের কান চেপে রাখত এবং নিজেদের কাপড় মাথায় তুলে নিত।”

(সূরা নূহ, আয়াত ৭)

তারা তাঁর কথা একেবারে শুনতে চাইত না। তাঁকে মিথ্যুক, পাগল, পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করত। তারা বলেছিল—

“আমরা আপনাকে তো আমাদের মতোই একজন মানুষ হিসাবে দেখি।”

(সূরা হূদ, আয়াত ২৭)

এর পাশাপাশি, তারা তাঁর অনুসারীদের নিম্নবিত্ত ও ‘অবজ্ঞাত’ বলে তুচ্ছ করত। তাদের অভিযোগ ছিল—

“আপনার অনুসারীরাই তো দরিদ্র, অবুঝ, অসামাজিক লোক।”

হুমকি ও নির্যাতনের মাত্রা

সময়ের সাথে সাথে তাঁদের বিরোধিতা শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাঁকে শারীরিকভাবে ক্ষতির হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়—

“আপনাকে অবশ্যই পাথর ছুঁড়ে মারা হবে।”

(সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত ১১৬)

নূহ (আ.) তাঁর নিজের স্ত্রী ও পুত্রকেও দাওয়াহ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবারও তাঁকে অমান্য করেছিল। তাঁর পুত্র ‘কানান’ ছিল অবিশ্বাসীদের মধ্যে।

আল্লাহর দিকে অভিযোগ ও দোয়া

জাতির অব্যাহত অবাধ্যতা দেখে নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন—
“হে আমার প্রভু! আমি পরাস্ত হয়েছি, তুমি সাহায্য কর।”

(সূরা আল-কামার, আয়াত ১০)

এটি ছিল গভীর বেদনা, ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার দৃষ্টান্ত।

মহাপ্লাবনের সিদ্ধান্ত

যখন তাঁর জাতি অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করে এবং কোনোভাবেই সৎপথে ফিরে আসার লক্ষণ দেখায়নি, তখন আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। নৌকা বানাতে গিয়েও তাঁকে বিদ্রোপ করা হয়—

“হে নূহ! আপনি কি জাহাজ বানাচ্ছেন মরুভূমিতে?”

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে এক মহাপ্লাবন নাযিল হয় এবং সত্য অস্বীকারকারীরা ধ্বংস হয়। নূহ (আ.) এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা অল্প সংখ্যক অনুসারী উদ্ধার পান।

নূহ (আ.)-এর দাওয়াহ থেকে শিক্ষণীয় দিক

নবী নূহ (আ.)-এর দীর্ঘ দাওয়াহ জীবন আমাদের শেখায়—

- দাওয়াহতে ধৈর্য অপরিহার্য,
- সত্য পথের দাঁকে প্রতিকূলতা পরীক্ষার অংশ,
- সংখ্যার উপর নির্ভর নয়; সাফল্য আল্লাহর কাছে,
- তাওয়াঙ্কুল ও অবিচলতা দাওয়াহর প্রকৃত শক্তি।

৩.২ নবী হুদ (আ.) এর দাওয়াহর বার্তা ও জাতির প্রতিক্রিয়া

নবী হুদ (আ.) ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যিনি আদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিলেন। আদ জাতি ছিল ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জনপদ—উঁচু দালান, উন্নত স্থাপত্য, দেহে বলশক্তি ও সম্পদে প্রাচুর্য তাদের অহংকারী করে তুলেছিল। তারা আল্লাহকে ভুলে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল এবং নিজেদের ক্ষমতাকে চূড়ান্ত মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল—কেউই তাদের পরাজিত করতে পারবে না।

এই অবস্থায় হুদ (আ.) তাওহীদের বার্তা নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

“হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।”

(সূরা হুদ ৫০)

তিনি তাদেরকে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে অবাধ্যতা ও কৃতঘ্নতা সর্বনাশ ডেকে আনে। তিনি আরও বলেছিলেন—

“আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল আল্লাহর কাছে।”

এটি তার দাওয়াহর নিঃস্বার্থ চরিত্রের এক নিদর্শন।

কিন্তু আদ জাতি তার প্রতি কটুক্তি করল। তারা বলল—

“তুমি কি আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে চাও?”
কেউ কেউ বলল— “তুমি তো বোধহয় জাদুগ্রস্ত!”

তারা ক্ষমতার গর্বে হুদ (আ.) কে অবজ্ঞা করল এবং আল্লাহর শাস্তির সতর্কতা অস্বীকার করে দিল। অবশেষে তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতা পরিবর্তন না করায় আল্লাহ তাদের ওপর দীর্ঘ খরা, এরপর এক প্রচণ্ড বায়ুঝড় বর্ষণ করলেন, যা সাত রাত ও আট দিন ধরে চলেছিল— ফলস্বরূপ পুরো আদ জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। আর আল্লাহ হুদ (আ.) ও মুমিনদের রক্ষা করেন।

হুদ (আ.) এর দাওয়াহ আমাদের শেখায়—আহ্বানকারীর সত্য, নিষ্ঠা, নরম ভাষা ও ধৈর্য; আর অনুসারীদের জন্য—অহংকার ও অবাধ্যতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

৩.৩ নবী সালেহ (আ.) এর দাওয়াহ ও জাতির প্রতিক্রিয়া

নবী সালেহ (আ.) প্রেরিত হন সামূদ জাতির কাছে। সামূদ জাতি ছিল প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত, পর্বত কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করত, সমৃদ্ধ-শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল; তারা মূর্তি-পূজায় লিপ্ত ছিল এবং সমাজে অন্যায়, বিলাসিতা ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সালেহ (আ.) তাদের সামনে তাওহীদের বার্তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন—

“হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত কর; তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই।”
(সূরা হুদ ৬১)

তারা সালেহ (আ.) কে একজন জ্ঞানী, নীতিবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে চিনত। তাই প্রথমদিকে তার প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু যখন তিনি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর পথে আসার আহ্বান জানালেন, তখন তাদের অহংকার ও ক্ষমতার লালসা বাধা হয়ে দাঁড়াল।

তারা সালেহ (আ.) এর কাছে একটি মোজেজা দাবি করল—পাহাড় থেকে এক জীবন্ত উষ্ট্রী বের করে আনতে হবে। আল্লাহ তাদের সামনে তাঁর নিদর্শন হিসেবে “নাকাতুল্লাহ”—আল্লাহর উষ্ট্রী পাঠালেন। সালেহ (আ.) তাদের বললেন—

“এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন, তাকে ক্ষতি করোনা, তার জন্য নির্ধারিত দিনে পানি পান করতে দিও।”

সামূদ জাতির একদল মুমিন সালেহ (আ.) এর দাওয়াহ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিশ্বাসীরা উষ্ট্রীটিকে বোঝা মনে করত। অবশেষে তারা পরিকল্পনা করে উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং সালেহ (আ.) এর সতর্কতাকে উপহাস করে বলল—

“শাস্তি আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হও!”

এভাবে তারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে নিজেদের ওপর শাস্তির দরজা খুলে দেয়। কিছুদিন পর তাদের ওপর নেমে আসে এক ভয়ংকর বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প—যাতে মুহূর্তেই পুরো সামূদ জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। আর সালেহ (আ.) দুঃখভরে বলেন—

“হে আমার জাতি! আমি তো তোমাদের মঙ্গলকামী ছিলাম, কিন্তু তোমরা উপদেশ গ্রহণ করলে না।”

সালেহ (আ.) এর দাওয়াহ আমাদের শেখায়—

- আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা বড় গোনাহ,
- অহংকার সত্যকে গ্রহণে বাধা দেয়,
- দাঁষ্ট কখনো ক্ষতি কামনা করে না; বরং মানুষের হিদায়াতই তার লক্ষ্য,
- অবাধ্যতা ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিণতি অনিবার্য।

৩.৪ নবী ইবরাহিম (আ.) এর তাওহীদের আহ্বান

নবী ইবরাহিম (আ.) তাওহীদের আহ্বানে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি এমন এক সমাজে জন্ম নেন যেখানে পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন শিরক সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আগুন এবং হাতের তৈরি মূর্তিগুলোই ছিল তাদের দেবতা। শুধু সমাজই নয়, তাঁর নিজ পরিবারের বৃহত্তম ব্যক্তি—পিতা আযার—ছিলেন মূর্তি নির্মাতা ও পুরোহিত। এই পরিবেশের মাঝেই ইবরাহিম (আ.) মন-প্রাণ উজাড় করে সত্য অনুসন্ধান শুরু করেন। চারপাশে প্রচলিত বিশ্বাসকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তিনি

পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাশীল যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে আকাশ-পৃথিবীর কোনো পরিবর্তনশীল সত্তা কখনোই প্রকৃত উপাস্য হতে পারে না। তিনি একে একে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের বিলীন হয়ে যাওয়া দেখে ঘোষণা করেন—

“আমি অস্তমিত হওয়া জিনিসকে ভালোবাসি না।” (সূরা আন‘আম ৭৬-৭৮)

—এটি ছিল তাঁর তাওহীদ সন্ধানের যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের সূচনা। তারপর তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন—

“আমি সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।” (সূরা আন‘আম ৭৯)।

এরপর ইবরাহিম (আ.) প্রথমেই দাওয়াহ শুরু করেন সবচেয়ে নিকটজন—তার পিতা ও পরিবার থেকে। তিনি অত্যন্ত কোমল, সম্মানজনক ভাষায় পিতাকে বলেছিলেন—

“হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন জিনিস ইবাদত করেন যা শোনে না, দেখে না এবং কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না?” (সূরা মারইয়াম ৪২)

কিন্তু জাতির মতো পিতাও তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাওয়াহর জবাবে হুমকি দেন। তবুও ইবরাহিম (আ.) ধৈর্য, নৈতিকতা ও দয়ার পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—“আমি আপনার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।” তাঁর এই আচরণ দাঈর চরিত্রের সর্বোচ্চ রূপ।

পরবর্তীতে তিনি তার পুরো জাতিকে আল্লাহর একত্ব বুঝাতে যুক্তিনির্ভর এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ নেন—মূর্তি ভাঙার ঘটনা। তাঁর জাতির লোকেরা উৎসব উপলক্ষে বাইরে গেলে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং সবচেয়ে বড় মূর্তিটি ছাড়া সব মূর্তি ভেঙে ফেলেন। আর কুঠারটি ঝুলিয়ে দেন বড় মূর্তির কাঁধে। ফিরে এসে জাতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন ইবরাহিম (আ.) অবিশ্বাসীদের বুদ্ধিকে তাদের নিজের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে বলেন—“জিজ্ঞেস করুন, বড় মূর্তিটিই তো কুঠারটি হাতে ধরে আছে!” এতে তারা নিজেই স্বীকার করে—“এগুলো তো কথা বলতে পারে না।” এই যুক্তি ছিল অতুলনীয়; যা দেখিয়ে দেয়—মূর্তিরা উপাস্য হতে পারে না। কিন্তু সত্যকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে জাতি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐতিহাসিকভাবে বলা হয় এটি ছিল মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ডলোর একটি। তখন আল্লাহ আদেশ করেন—

“হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।” (সূরা আশ্বিয়া ৬৯)
—এটি ছিল তাওহীদের পথে দাঈর দৃঢ় বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পুরস্কার।

ইবরাহিম (আ.) এরপরও তাওহীদের আহ্বান অব্যাহত রাখেন—শুধু জাতির মধ্যেই নয়, দেশ-বিদেশেও হিজরত করে। তিনি সম্প্রচার করেন আল্লাহর একত্ব, আল্লাহর প্রতি ভরসা, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার। তাওহীদের প্রচারের আদর্শিক রূপ হিসেবে আল্লাহ তাকে ঘোষণা করেন—

“নিশ্চয়ই ইবরাহিম একাকী এক উম্মত ছিল; আল্লাহর আনুগত্যশীল ও সত্যবাদী।” (সূরা নাহল ১২০)

তিনি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম করেন—হোক তা আগুনে নিক্ষেপ, পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি দেওয়ার পরীক্ষা, বা একটি নির্জন মরুভূমিতে কা’বা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর হৃদয় সর্বদা ঘোষণা করত—

“নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু—সবই আল্লাহর জন্য।” (সূরা আন’আম ১৬২)।

ইবরাহিম (আ.) এর তাওহীদের আহ্বান তাই তিনটি আদর্শে উজ্জ্বল—

- ১) যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ,
- ২) তাওহীদের জন্য আত্মত্যাগ ও ধৈর্য,
- ৩) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর উপর ভরসা।

এ কারণে তাঁকে বলা হয়—“খলিলুল্লাহ”, অর্থাৎ “আল্লাহর প্রিয় বন্ধু”—এবং তাঁর দাওয়াহ সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরকালীন আলোকস্তম্ভ।

৩.৫ নবী মূসা (আ.) এর ফেরাউনের প্রতি দাওয়াহ

নবী মূসা (আ.) এর দাওয়াহ মানব ইতিহাসের অন্যতম কঠিন, চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও শিক্ষণীয় আহ্বান। তিনি এমন এক অত্যাচারী শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছিলেন—ফেরাউন, যে নিজেকে কেবল রাজা নয়, বরং “রব্বুল আ’লা” দাবি করত। সে বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল, তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত এবং জন্মানো পুত্র শিশুদের হত্যা করত। আল্লাহ মূসা (আ.) কে দাওয়াহর দায়িত্ব দিয়ে বললেন—

“তুমি এবং তোমার ভাই হারুন-দু’ জনে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউনের কাছে যাও এবং তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ নেবে।”(সূরা ত্বা-হা ৪৩-৪৪)।

এ নির্দেশ মূসা (আ.) এর দাওয়াহর মূলনীতি স্পষ্ট করে-সবচেয়ে জালেম ব্যক্তির প্রতিও দাওয়াহ হতে হবে কোমল, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ। মূসা (আ.) আল্লাহর এই আদেশ মান্য করে ফেরাউনের দরবারে গিয়ে ঘোষণা করেন- “হে ফেরাউন! আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের রসূল।” তিনি ফেরাউনকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন, অত্যাচার থেকে সরে আসতে বলেন এবং আল্লাহর পথে চললে মুক্তি ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দেন। এর জবাবে ফেরাউন অহংকারে অন্ধ হয়ে যান। তিনি বলে বসেন- “আমি কি তোমাকে আমাদের ঘরে লালন-পালন করিনি?” এভাবে তিনি সত্যকে ব্যক্তিগত উপকারের সাথে জড়িয়ে দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

পরে ফেরাউন মূসা (আ.) কে জাদুকর বলে দাবি করে এবং তাঁর সত্যবর্তা প্রমাণের জন্য মুজিয়া চাই। আল্লাহর অনুমতিতে তিনি লাঠিটি নিক্ষেপ করলে তা জীবন্ত সাপ হয়ে যায়, আর হাত বের করলে তা আলো বিকিরণ করে। তবুও ফেরাউন সত্য অস্বীকার করে মিশরের জাদুকরদের ডেকে আনে।

যখন জাদুকররা মূসা (আ.) এর মুজিয়া দেখে সত্য উপলব্ধি করে সিজদায় পড়ে যায়- “আমরা হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান এনেছি” -তখন ফেরাউন রোষে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং তারা শান্তির হুমকি দেয়। এমন কঠিন অবস্থায়ও মূসা (আ.) দাওয়াহ চালিয়ে যান, বনী ইসরাঈলের ধৈর্য ধরে থাকতে বলেন এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেন। অবশেষে ফেরাউন ও তার সেনাদের সমস্ত অবাধ্যতা চরমে পৌঁছালে আল্লাহ মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগের নির্দেশ দেন। যখন ফেরাউন তাদের ধাওয়া করে, তখন আল্লাহ সমুদ্র বিভক্ত করে মুমিনদের নিরাপদে পার করে দেন এবং ফেরাউনকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন-যা তাওহীদের বিজয় ও অহংকারের পরিণতির চূড়ান্ত শিক্ষা। নবী মূসা (আ.) এর দাওয়াহ তাই আমাদের শেখায়-সত্য বলার দৃঢ়তা, জালেমের সামনে অবিচল সাহস, দাওয়াহর কোমলতা, ধৈর্য, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না।

৩.৬ নবী ঈসা (আ.) এর দাওয়াহ ও মানবতার শিক্ষা

নবী ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর এক মহান রসূল, যিনি বনী ইসরাঈলের নৈতিক অবক্ষয়, ভ্রান্ত আকীদা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাওহীদ ও মানবতার বার্তা

নিয়ে প্রেরিত হন। তাঁর দাওয়াহর প্রথম ভিত্তি ছিল—তাওহীদ, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য। তিনি তাদের বলেছিলেন—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও রব ও তোমাদের রব – সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।”
(সূরা মায়েদা ৭২)।

ঈসা (আ.) কেবল তাত্ত্বিক দাওয়াহ দেননি; তিনি মানুষের আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও পারস্পরিক আচরণ সংস্কারের জন্য গভীর ভালোবাসা, দয়া ও চরিত্রবান আচরণকে দাওয়াহর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেন। কুরআনে উল্লেখ আছে—

“আর তিনি আমাকে করেছেন দয়ালু ও নম্র।” (সূরা মারইয়াম ৩২)—

এটি তার দাওয়াহর মমত্ববোধের পরিচয়।

ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতদের ভুল ব্যাখ্যা, ধর্মীয় কঠোরতা এবং মানুষকে কষ্টদায়ক ধর্মীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করার জন্য দাওয়াহ দেন। তাঁর প্রেরিতব্য মিশন ছিল—আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত শিক্ষা ফিরিয়ে আনা, যেমন আল্লাহ বলেন—

“আমি তোমাদের কাছে হিকমত ও তাওরাতের ব্যাখ্যা নিয়ে এসেছি, যাতে তোমরা মতবিরোধে না পড়ো।” (সূরা যুখরুফ ৬৩)।

তিনি আল্লাহর অনুমতিতে নানা মুজিজা প্রদর্শন করেন—অন্ধকে সুস্থ করা, কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্য, মৃতকে জীবিত করা, মাটির পাখিকে প্রাণ দেওয়া—যা ছিল তাঁর সত্য বার্তার প্রমাণ এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন। কিন্তু তবুও বনী ইসরাঈলের অনেকেই তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে এবং তার দাওয়াহ প্রতিরোধ করে; অথচ ঈসা (আ.) কখনো প্রতিহিংসা দেখাননি, বরং ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও মানবিকতার মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতার সর্বোচ্চ রূপ তুলে ধরেছিলেন।

ঈসা (আ.) এর দাওয়াহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—মানবতাকে এক পরিবার হিসেবে দেখা। তিনি বিনম্র, অসহায়, দরিদ্র এবং সমাজের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ও দায়িত্বশীলতা দেখাতেন। তাঁর শিক্ষা ছিল—ঘৃণার বদলে ভালোবাসা, অহংকারের বদলে নম্রতা, এবং বিভেদের বদলে মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা। তিনি মানুষকে পরস্পর সহযোগিতা, সততা, ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা শেখান। নিজের দাওয়াহর চরম বিরোধিতার পরেও তিনি দয়া ও শান্তির বার্তা প্রচার করে গেছেন, এবং আল্লাহর নির্দেশে

যখন তাঁকে আকাশে উত্তোলন করা হয়, তখনও তিনি তাঁর অনুসারীদের ঐক্য, সত্যে দৃঢ়তা ও নৈতিকতায় অটল থাকার শিক্ষা রেখে যান।

নবী ঈসা (আ.) এর দাওয়াহ তাই মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন আদর্শ—তাওহীদে দৃঢ়তা, নৈতিকতা ও নম্রতা, মানবিক ভালোবাসা, এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি অবিচল থাকা।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াতি জীবন

৪.১ নবুওয়াতের সূচনা ও প্রথম আহ্বান

নবুওয়াতের সূচনা ঘটে যখন মহান আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ দিতে নির্বাচন করেন। মক্কার চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অজ্ঞতা, কুসংস্কার, মূর্তিপূজা, নারী নির্যাতন, সামাজিক বৈষম্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাঝে তিনি সত্য অনুসন্ধানের হেরা গুহায় নির্জন সাধনায় লিপ্ত হতেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশে পৌঁছে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহি নাজিল হয়—জিবরাইল (আ.) এসে বলেন: “ইক্কা” —পড়।” এবং এই নির্দেশের সঙ্গে সূরা আলাকের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়—“পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

এটি ছিল নবুওয়াতের সূচনা এবং মানবজাতির উপর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দায়িত্ব অর্পণের মুহূর্ত। প্রথম অভিজ্ঞতায় তিনি ভীত হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী খাদিজা (রা.) তাঁকে সাহুনা দেন, প্রমাণ করেন যে একজন সত্যবাদী, আমানতদার এবং সংচরিত্রবান মানুষ কখনোই বিভ্রান্ত বা প্রতারিত হতে পারেন না। পরে ওরাকা ইবন নওফল নবুওয়াতের সত্যতা নিশ্চিত করেন এবং জানান যে এ-ই সেই জিবরাইল যিনি মূসা (আ.)-এর কাছেও এসেছিলেন। এর পরে কিছু সময় ওহি বন্ধ থাকে, যা নবীকে গভীর চিন্তায় রাখে; কিন্তু আল্লাহ পরবর্তীতে সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ করে তাঁর দায়িত্ব স্পষ্ট করে দেন—“হে বস্ত্রে আবৃত ব্যক্তি! উঠে দাঁড়াও এবং সতর্ক করো।”

এভাবেই নবুওয়াতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় এবং দাওয়াহ শুরু হয় সর্বপ্রথম নিজের পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে। তিনি তাদেরকে গোপনে তাওহীদের পথে আহ্বান করেন, শিরক ত্যাগের নির্দেশ দেন, নৈতিকতা ও শান্তির বার্তা প্রচার করেন। প্রথম তিন বছরে দাওয়াহ ছিল সম্পূর্ণ গোপন; এসময়ে যেসব ব্যক্তি ইসলামের প্রথম আলোকে গ্রহণ করেন—খাদিজা (রা.), আলী (রা.), যাইদ (রা.) এবং আবু বকর (রা.)—তারা পরে ইসলাম প্রচারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। নবুওয়াতের এই সূচনা ধাপে রাসূল (সা.)-এর চরিত্র, ধৈর্য, সত্যবাদিতা এবং আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা ইসলামী দাওয়াহর ভিত্তিকে মজবুত করে তোলে এবং মানবজাতির সামনে এক নতুন, পবিত্র যুগের সূচনা করে।

৪.২ গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াহ — মক্কা পর্ব

নবুওয়াত লাভের পর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াহ কার্যক্রম প্রথমে গোপনে এবং পরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্যে বিস্তার লাভ করে। মক্কা পর্বে তাঁর দাওয়াহর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ধৈর্য, প্রজ্ঞা, কৌশল, এবং বিপুল প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিচল থেকে সত্যের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

১. গোপন দাওয়াহর সূচনা (প্রথম তিন বছর)

প্রথম ওহি অবতীর্ণের পর—আল্লাহর নির্দেশে—নবী (সা.) তাঁর নিকটতম মানুষদের তাওহীদ, নৈতিকতা ও সৎপথের দিকে আহ্বান শুরু করেন। এই সময় তিনি জানতেন যে মক্কার সমাজ মূর্তি পূজায় গভীরভাবে নিমজ্জিত, তাই প্রকাশ্য ঘোষণা করলে কঠোর প্রতিক্রিয়া আসবে। তিনি প্রথমে যাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকেন তারা হলেন—

- খাদিজা (রা.) — প্রথম নারী,
- আলী (রা.) — প্রথম কিশোর,
- যাইদ ইবন হারিসা (রা.),
- এবং আবু বকর (রা.), যিনি পরে ইসলামের বহু মহৎ ব্যক্তিকে দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করান (যেমন উসমান, জুবাইর, আবদুর রহমান ইবন আওফ, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ)।

মক্কার একটি নির্জন স্থানে—দারুল আরকাম—এ নতুন মুসলমানরা গোপনে একত্র হতেন; সেখানে নবী (সা.) তাদের তাওহীদ, ঈমান, আল্লাহর প্রতি ভরসা, চরিত্র নির্মাণ ও ধৈর্যের শিক্ষা দিতেন। এই গোপন পর্ব ইসলামী দাওয়াহর ভিত্তি গড়ে তোলে এবং একটি দৃঢ়, বিশ্বস্ত, প্রশিক্ষিত দল সৃষ্টি করে।

২. প্রকাশ্য দাওয়াহর নির্দেশ

প্রায় তিন বছর পর আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ আসে—
“আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করুন” (সূরা আশ-শু‘আরাঃ ২১৪)।
এর ফলে নবী (সা.) সাফা পাহাড়ে উঠে সমগ্র কুরাইশকে সত্যের দিকে আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ, এক আল্লাহর ইবাদত, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়বিচারের প্রতি আহ্বান করেন। এতে তাঁর নিজের গোত্রনেতা আবু লাহাব তীব্র বিরোধিতা করে, যা পরে কুরআনে নিন্দিত হয়।

৩. কুরাইশদের বিরোধিতা ও দাওয়াহর বিস্তার

দাওয়াহ প্রকাশ্য হওয়ার পর কুরাইশরা বুঝতে পারে যে ইসলামের বার্তা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করছে। ফলে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়—

- মুসলমানদের অবমাননা, নির্যাতন ও উপহাস,
- ধনীদের উপর সামাজিক বয়কট,
- গরিব মুসলমানদের উপর শারীরিক অত্যাচার (যেমন বিলাল, খব্বাব, সুহাইব, আম্মার ইবন ইয়াসির),
- রাসূল (সা.)-কে হত্যা বা থামিয়ে দেওয়ার নানান ষড়যন্ত্র।

তবুও নবী (সা.) দাওয়াহ চালিয়ে যান; তিনি মক্কার বাজার, হজের মৌসুমে আগত যাত্রী, এবং বিভিন্ন গোত্রনেতাকে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেন। তাঁর চরিত্র, যুক্তি, করুণা ও ধৈর্য মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে, এবং মক্কার বাইরে থেকেও কিছু ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আগ্রহী হন।

৪. সামাজিক বয়কট ও পরীক্ষার সময়

নবী (সা.), তাঁর পরিবার ও মুসলমানদের উপর তিন বছরের কঠোর বয়কট আরোপ করা হয়, যা শিবে আবি তালিব-এ কাটাতে হয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা—এসবের মধ্যে ধৈর্য, পরস্পর সহযোগিতা ও ঈমান দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই সময় আল্লাহর সাহায্যের প্রতি মুসলমানদের আস্থা আরও গভীর হয়।

৫. তায়েফে দাওয়াহ ও অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য

মক্কায় দাওয়াহ কঠিন হয়ে পড়লে নবী (সা.) তায়েফে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে যান; কিন্তু সেখানকার নেতারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, এমনকি পথের দুই পাশে দাঁড় করিয়ে শিশুদের দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করায়। আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন—
“হে আল্লাহ, তারা বুঝে না, তাই তাদেরকে হেদায়েত দাও।”
এটি দাওয়াহর শ্রেষ্ঠ করুণার উদাহরণ।

৬. মক্কা পর্বের দাওয়াহর মোট ফলাফল

দশ বছরের বেশি সময় কঠোর প্রতিকূলতা, অত্যাচার ও শান্তির বার্তা প্রচারের পর ইসলামের শক্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়। দাওয়াহর কৌশল, ধৈর্য, চরিত্র, আল্লাহর উপর নির্ভরতা এবং আদর্শ আচরণের মাধ্যমে নবী (সা.) একটি ঈমানী দল গঠনে সক্ষম হন—যারা পরে মদিনায় ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী দাওয়াহর প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

৪.৩ নির্যাতন, প্রতিবন্ধকতা ও রাসূল (সা.)-এর ধৈর্য

মক্কা পর্বে দাওয়াহ প্রকাশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ নেতারা উপলব্ধি করে যে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত তাওহীদের বার্তা তাদের দীর্ঘদিনের শিরকভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলছে। ফলে তাঁকে দাওয়াহ থেকে বিরত রাখতে নানা ধরনের নির্যাতন, অপমান, হুমকি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। তা সত্ত্বেও নবী (সা.)-এর ধৈর্য, নৈতিক দৃঢ়তা ও আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা ছিল দাওয়াহর ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত।

কুরাইশরা কখনো তাঁর প্রতি সরাসরি হুমকি দেয়, কখনো তাঁকে ‘কাহিন’, ‘মাঝিন’, ‘জাদুকর’, ‘মিথ্যুক’ ইত্যাদি উপাধিতে অপমান করে। তাঁকে দেখে পথের শিশুদের হাসাহাসি, পথ রোধ করে কটু কথা বলা, তাওহীদের প্রচার বন্ধের উদ্দেশ্যে প্রলোভন দেখানো—এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। একদিন তিনি যখন কাবা শরিফে সেজদায় ছিলেন, তখন তাঁর পিঠে উটের নোংরা নাড়িভুড়ি ফেলে তাঁকে উপহাস করা হয়। তবুও তিনি মাথা তুলে দাঁড়ানোর পর শুধু দোয়া করেন: “হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশকে ক্ষমা করো, তারা জানে না।”

শুধু তিনিই নন—মুসলমানদের মধ্যেও যাদের সামাজিক অবস্থান দুর্বল ছিল, তাদের উপর অত্যাচার ছিল আরো কঠিন। বিলাল (রা.)-কে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে পাথর চেপে ধরা, খব্বাব (রা.)-এর পিঠে আগুনের কয়লা চেপে দেয়া, সামিয়াহ (রা.)-কে বর্শাবিন্দ করে শহীদ করা—এসব দৃশ্য নবী (সা.)-এর হৃদয় ব্যথিত করলেও তিনি তাঁদেরকে ধৈর্য ধরে স্থির থাকার উপদেশ দিতেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতেন।

কুরাইশরা দাওয়াহ থামাতে সবধরনের কৌশল প্রয়োগ করে—আর্থিক বয়কট, সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ, হুমকি ও অপমান; এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করে। তবুও নবী (সা.) কখনো তাঁর মিশন থেকে পিছু হটেননি। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর ধৈর্য, সংযম ও আল্লাহর উপর অটল আস্থা ছিল দাওয়াহর শক্তি। তাঁর ধৈর্যের পাশাপাশি প্রতিটি বিপদেই তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন এবং কুরআনের নির্দেশকে সামনে রেখেই এগিয়ে যেতেন—“সুতরাং তুমি যে আদেশ পেয়েছ, তা পরিষ্কারভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের তোয়াক্কা করো না।” (সূরা হিজর ১৫:৯৪)

এই সমস্ত বৈরী পরিস্থিতিতেও নবী (সা.)-এর অন্তর ছিল করুণা ও ক্ষমাশীলতায় পূর্ণ। তিনি কখনো কোনো জালিম ব্যক্তির নামে বদদোয়া করেননি, বরং তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন। তাঁর এই ধৈর্য, চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিই পরবর্তীতে ইসলামের বিজয়ের পথ সুগম করে।

৪.৪ মদিনা পর্বে দাওয়াহ — রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের দিক

মদিনায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ নতুন এক পর্বে প্রবেশ করে—যেখানে শুধু তাওহীদের আহ্বান নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র, শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং মানবকল্যাণমুখী সভ্যতা গঠনের দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর ন্যস্ত হয়। মক্কা পর্ব ছিল দাওয়াহর ভিত্তি গঠন ও ধৈর্যের পরীক্ষা; আর মদিনা পর্ব ছিল দাওয়াহর বাস্তবায়ন, সমাজ পুনর্গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার পর্ব।

মদিনায় আসার পর রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন, যা কেবল নামাজের স্থান নয়—বরং শিক্ষা, দাওয়াহ, বিচারকার্য, পরামর্শ সভা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন, যা আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজে আগে কখনো দেখা যায়নি। এই ভ্রাতৃত্ব ইসলামী সমাজে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সামাজিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

মদিনা পর্বে নবী (সা.)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দাওয়াহর অংশ ছিল “মদিনা সনদ” রচনা—যা বিশ্বের প্রথম লিখিত বহুজাতি সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত। এতে মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রের অধিকার, দায়িত্ব ও পরস্পরের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে নবী (সা.) দেখিয়ে দেন যে দাওয়াহ শুধু ধর্মীয় আহ্বানই নয়; বরং ন্যায়, শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

এছাড়া তিনি সমাজের দুর্বল শ্রেণির অধিকার রক্ষায় বিশেষ নজর দেন—অন্যায় অত্যাচার, সুদ, মদ, জুয়া, ব্যভিচার ও সামাজিক অবিচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন; দান-সদকা, যাকাত ও সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে দাঁড় করান। শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক চরিত্র গঠন, বিচারকার্যে সমতা, নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা—এসব ছিল মদিনা পর্বের দাওয়াহর গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাসূল (সা.) দাওয়াহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সম্প্রসারিত করেন। পার্শ্ববর্তী রাজাদের নিকট চিঠি পাঠিয়ে তাওহীদের আহ্বান জানান, তাদেরকে শান্তি ও ন্যায়ের পথে আসার সুযোগ দেন। সেই সাথে যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও তিনি ন্যায়নীতি, মানবিকতা ও আত্মরক্ষার সীমাবদ্ধ নীতিমালা জারি করেন—যা দাওয়াহর আদর্শিক রূপকে আরও স্পষ্ট করে।

মোটকথা, মদিনা পর্বে দাওয়াহর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠা, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহর বিধানকে বাস্তব রূপ দেওয়া। এর মাধ্যমে

নবী (সা.) মানবতার ইতিহাসে এক অনন্য, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলেন— যা পরবর্তী যুগে সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে ওঠে।

৪.৫ আন্তর্জাতিক দাওয়াহ — বিদেশি শাসকদের নিকট চিঠি পাঠানো

মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের দাওয়াহ শুধু আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং নবী মুহাম্মদ (সা.) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি, তাওহীদ ও মানবতার বার্তা পৌঁছে দিতে কূটনৈতিক কাঠামো ব্যবহার করেন। এই পর্বে নবী (সা.)-এর দাওয়াহর বৈশ্বিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়—যা ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। হিজরি ৬-৭ সালের দিকে হুদাইবিয়া চুক্তির পর যখন আরব অঞ্চলে তুলনামূলক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তিনি বিশ্বের শীর্ষ সম্রাট ও রাজাদের নিকট দূত পাঠিয়ে ইসলামের আহ্বান জানান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগ নয়; বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানবজাতিকে সত্যের আলো পৌঁছে দেওয়া।

নবী (সা.)-এর পাঠানো এই চিঠিগুলো অত্যন্ত শালীন, কূটনৈতিক এবং সার্বজনীন মূল্যবোধে পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি চিঠির সূচনায় তিনি লিখতেন— “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম... শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন।”

এরপর তিনি সম্রাট বা রাজাকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাতেন, মানবতার কল্যাণের বার্তা তুলে ধরতেন এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা দাওয়াহর ভিত্তি স্পষ্ট করতেন— “কহ, হে আহলে কিতাব, এসো আমরা এমন এক কথায় সমবেত হই যা আমাদের মধ্যে অভিন্ন—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না।” (আলে ইমরান, ৩:৬৪)

তিনি যেসব শাসকের নিকট চিঠি পাঠান, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—

- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস,
- পারস্য সম্রাট খোসরো (কিসরা),
- মিশরের শাসক মোকাওকিস,
- হাবশার ন্যায়পরায়ণ রাজা নাজাশি,
- বাহরাইনের মুনযির,
- গাসসানের নেতা হারিস ইবন আবি শামির,
- এবং আরব উপদ্বীপের আরও বিভিন্ন গোত্রপ্রধান।

এই শাসকদের প্রতিক্রিয়া একেকজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নবী (সা.)-এর সত্যতার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেও রাজনৈতিক চাপের কারণে ঈমান আনতে সাহস করেননি। মিশরের রাজা মোকাওকিস সৌজন্যপ্রসূত উপহার পাঠিয়েছিলেন, যদিও তিনি

ইসলাম গ্রহণ করেননি। হাবশার নাজাশি চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈমান গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেন। পক্ষান্তরে, পারস্য সম্রাট কিসরা অহংকারবশত চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেন; ফলে নবী (সা.) তাঁর জন্য আল্লাহর শান্তি প্রার্থনা করেন, যা পরবর্তীতে ঘটে।

এই আন্তর্জাতিক দাওয়াহ শুধু রাজনৈতিক কূটনীতি নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশ্বিক মানবতা প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব প্রয়াস ছিল। এতে স্পষ্ট হয় যে ইসলাম দাওয়াহর বার্তা কোনো অঞ্চল, জাতি বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য। নবী (সা.)-এর কূটনৈতিক দূতেরা অপর জাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সংলাপের দরজা খুলে দেয় এবং বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে বোঝাপড়া, শান্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন করে।

সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক দাওয়াহর এই পর্ব প্রমাণ করে যে ইসলামী রাষ্ট্র কেবল শক্তি বা রাজনীতির জন্য নয়—বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণে সত্য, ন্যায়, শান্তি ও তাওহীদ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত। নবী (সা.)-এর পাঠানো চিঠিগুলো আজও মানব ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ আহ্বানের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।

৪.৬ রাসূল (সা.)-এর দাওয়াহর নৈতিক ও আদর্শিক দিক

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহ ছিল কেবল ভাষাগত উপদেশ বা ধর্মীয় বার্তা প্রদান নয়; বরং তা ছিল এক পূর্ণাঙ্গ নৈতিক, মানবিক ও আদর্শিক জীবনব্যবস্থা। তাঁর দাওয়াহর ভিত্তি ছিল চরিত্র, সত্যবাদিতা, করুণা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ। তিনি শুধু কথায় ইসলাম প্রচার করেননি; বরং তাঁর দৈনন্দিন আচরণ, সিদ্ধান্ত, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, পরিবারকে শিক্ষাদান—সবক্ষেত্রেই দাওয়াহর আদর্শিক রূপ ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর চরিত্রকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন—

“আর নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।” (সূরা কালাম, ৬৮:৪)

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াহর অন্যতম প্রধান নৈতিক দিক ছিল সত্যবাদিতা ও আমানতদারি। নবুওয়াত লাভের আগেই তিনি মক্কাবাসীর নিকট ‘আল-আমীন’ ও ‘আস-সাদিক’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই বিশ্বস্ততা দাওয়াহর জন্য মানুষের হৃদয়ে আস্থা সৃষ্টি করে, যার ফলে তাঁর কথায় মানুষ সত্যতা খুঁজে পায়। দাওয়াহর বার্তা শক্তিশালী হবার জন্য দাঁড়িয়ে চরিত্র যে কত গুরুত্বপূর্ণ—রাসূল (সা.) এর জীবনে তা সুস্পষ্ট।

তিনি ছিলেন অপরিসীম দয়ালু ও কোমল-হৃদয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—
“তোমার জন্য আল্লাহর রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছ।” (আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

এই কোমলতার মাধ্যমে তিনি বহু কঠিন হৃদয়কে নরম করেন, শত্রুকে বন্ধুকে রূপান্তর করেন, এবং দাওয়াহর জন্য সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তি তৈরি করেন। এমনকি তাঁকে যারা কষ্ট

দিত, তাঁদের জন্যও তিনি হেদায়েতের দোয়া করতেন; যা দাওয়াহর সর্বোচ্চ নৈতিকতার উদাহরণ।

দাওয়াহর আদর্শিক দিকগুলির মধ্যে ন্যায়বিচার ছিল অন্যতম। রাসূল (সা.) কখনও আত্মীয়তা, সম্পদ, গোত্র বা ক্ষমতার ভিত্তিতে বিচারকে প্রভাবিত হতে দেননি। তিনি ঘোষণা করেন— “তোমাদের আগে যে জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, তা এ কারণে যে তারা ধনী অপরাধীকে ছেড়ে দিত এবং গরিব অপরাধীকে শাস্তি দিত।” দাওয়াহর লক্ষ্য ছিল সমাজে এমন নৈতিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে ন্যায় সকলের জন্য সমানভাবে বজায় থাকে।

এছাড়া তিনি ছিলেন ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার সর্বোচ্চ আদর্শ। মক্কায়ে নির্যাতনের পর মদীনায়ে ক্ষমতা অর্জন করেও তিনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেননি। বরং মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি তাঁর হত্যাকারী ও নির্যাতনকারীদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন— “আজ তোমাদের জন্য কোন ভরসনা নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।” এটাই ছিল তাঁর দাওয়াহর সত্যিকারের রূপ—শান্তি, ক্ষমা ও মানবিকতার মাধ্যমে হৃদয় জয়। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াহতে সামাজিক দায়িত্ববোধও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি দরিদ্র, এতিম, নারী, দাস ও দুর্বল মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সবসময় অগ্রণী ছিলেন। দাওয়াহ শুধুমাত্র ঈমানের আস্থানে সীমাবদ্ধ থেকে সমাজ সংস্কারের কাজ যদি না করে—তবে তা পূর্ণতা পায় না—এই শিক্ষা তিনি তাঁর জীবন দিয়ে তুলে ধরেন।

সর্বোপরি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াহর নৈতিক ও আদর্শিক দিকসমূহ প্রমাণ করে যে, দাওয়াহ কেবল জ্ঞান দেওয়া নয়; বরং তা হৃদয়ের পরিশুদ্ধি, সমাজের উন্নয়ন এবং মানবতার কল্যাণের জন্য একটি পরিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন। তাঁর চরিত্রই ছিল দাওয়াহর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং মানবতার ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আলো।

পঞ্চম অধ্যায়

নবীগণের দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিকূলতা

৫.১ শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের বাধা

নবীগণের দাওয়াহ প্রচারের পথে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে কঠিন বাধা ছিল মানুষের প্রচলিত শিরক, কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস। আদিকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের ভুল রীতি, দেব-দেবীর পূজা, প্রতিমা ও আত্মাদের উপাসনাকে ধর্ম মনে করে আঁকড়ে ধরেছিল। এই ভুল বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত ছিল যে নবীদের তাওহীদের আহ্বান তারা নতুন, অস্বস্তিকর এবং পূর্বপুরুষের শিক্ষার বিরোধী বলে মনে করত। কুরআন এই মানসিকতাকে চিহ্নিত করে বলেছে: “তারা বলে, আমরা তো সেই পথই অনুসরণ করব, যার ওপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি।” (সূরা বাকারাহ-১৭০)

নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), ইবরাহিম (আ.)—প্রত্যেক নবীই জাতির কাছ থেকে একই ধরনের আপত্তির মুখোমুখি হন। তাদের জাতি বলত, “তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষ যা করত তা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে চাও?” এই অন্ধ অনুসরণই সত্য গ্রহণের পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে শিরককে স্পষ্টভাবে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় অন্যায (জুলুম) বলা হয়েছে:

“নিশ্চয়ই শিরক একটি বড় জুলুম।” (সূরা লুকমান-১৩)

শুধু প্রতিমা পূজাই নয়—ভাগ্যগণনা, অশুভ-শুভ লক্ষণ, মৃতদের আত্মা ও বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তাদের বিশ্বাসকে এমনভাবে বিকৃত করেছিল যে তারা এক আল্লাহর ইবাদতকে অবিশ্বাস্য মনে করত। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন: “আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে—তারা তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নয়।” (সূরা ইউনুস-১০৬)

এই ভুল বিশ্বাসগুলো মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে দিত এবং নবীদের সত্যবাণীকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করত। ফলে শিরক ও কুসংস্কার কেবল ঈমানের পথে বাধা ছিল না; বরং এগুলো সমাজে অজ্ঞতা, অন্ধতা এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি সৃষ্টি করত। নবীগণ

মহান প্রজ্ঞা, ধৈর্য এবং যুক্তিসম্মত উপস্থাপনার মাধ্যমে এই অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন—
কিন্তু বহু জাতি তাদের প্রাচীন কুসংস্কার ছেড়ে দিতে চায়নি।

৫.২ বিদ্রূপ, অপমান ও মানসিক নির্যাতন

নবীগণের দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের জাতির অন্যতম বড় বাধা ছিল বিদ্রূপ, অপমান ও অবিরাম মানসিক নির্যাতন। সত্যকে গ্রহণ না করে মানুষ বহু সময় নবীদেরকে উপহাস করত, তুচ্ছ করত এবং তাদের মিশনকে অমূলক বলে ব্যঙ্গ করত। এই আচরণ কেবল মজার ছলে উপহাস নয়; বরং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অহংকার, জেদ এবং আত্মিক অন্ধতার প্রকাশ। কুরআন জানায়—

“তাদের কাছে যখনই কোনো রসূল এসেছে, তারা তাকে উপহাস ছাড়া আর কিছুই করেনি।”

(সূরা হিজর-১১)

নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে সতর্ক করতেন, তারা তাঁকে পাগল, বিভ্রান্ত, এমনকি খেয়ালী বলে অপমান করত। কুরআনে তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

“আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখি।”

(সূরা আল-আরাফ-৬০)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও মক্কার কুরাইশরা ‘মাজনুন’ (পাগল), ‘সাহির’ (যাদুকর), ‘কাহিন’ (জ্যোতিষী) ইত্যাদি বলে অপমান করত। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বলেন—
“তারা বলে: ‘হে ব্যক্তি যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো অবশ্যই উন্মাদ।’”

(সূরা হিজর-৬)

বিদ্রূপ ও অপমানের উদ্দেশ্য ছিল নবীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া, দাওয়াহর অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে তাদের থেকে দূরে রাখা। কিন্তু নবীগণ অদম্য ধৈর্য, সহনশীলতা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাঁদের দাওয়াহ চালিয়ে গেছেন, যা দাওয়াহকারীদের জন্য চিরন্তন একটি শিক্ষা—সত্যের পথে চললে প্রতিকূলতা আসবেই, কিন্তু ধৈর্যই সত্যিকারের দাঁড়ির পরিচয়।

৫.৩ শারীরিক নির্যাতন ও হত্যাচেষ্টা

নবী-রাসূলগণ যখন তাওহীদ ও সত্যের দাওয়াহকে মানুষের সামনে তুলে ধরতেন, তখন বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া কেবল উপহাস বা মানসিক আক্রমণে সীমাবদ্ধ থাকত না; বরং তাদের ওপর নেমে আসত ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতন এবং হত্যাচেষ্টা। সত্যের আহ্বান স্থাপন সমাজের প্রচলিত শিরক, কুসংস্কার, স্বার্থ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিত বলে নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীরা নবীদের শারীরিকভাবে নির্মূল করার চেষ্টায় লিপ্ত হত। কুরআনে বহু ঘটনার মাধ্যমে এসব বর্বর আচরণ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নবী ইবরাহিম (আ.)-কে তার তাওহীদী দাওয়াহর কারণে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল—যা ছিল এক ভয়াবহ হত্যাচেষ্টা। আদ জাতি নবী হুদ (আ.)-কে পাথর ছুঁড়ে মারার হুমকি দেয়, যা তার দাওয়াহর প্রতি তাদের সহিংস প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সামূদ জাতি কেবল আল্লাহর উটনী হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং নবী সালেহ (আ.)-কে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে নবী মূসা (আ.)-কে প্রকাশ্যে হত্যা করার পরিকল্পনার মাধ্যমে দাওয়াহ দমনে চরম নির্যাতনের উদাহরণ স্থাপন করে। মক্কার কুরাইশ নেতারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার বাড়ি ঘিরে পরিকল্পিত আক্রমণের চেষ্টা করে।

এসব ঘটনা স্পষ্ট করে যে, দাওয়াহর ইতিহাসে শারীরিক নির্যাতন ছিল অত্যন্ত কঠোর ও বাস্তবসম্মত একটি বাধা। নবীগণ এসব বিপদের মুখেও অবিচল ছিলেন, কারণ তাদের ভরসা ছিল আল্লাহর উপর, যিনি প্রতিটি হত্যাচেষ্টা ও শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেও তাদের রক্ষা করেছেন। এই বাস্তবতা আজকের দাঈদেরও শিক্ষা দেয়—সত্যের পথে পরীক্ষা অনিবার্য, আর ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা হলো প্রতিকূল পরিবেশে দাওয়াহ অটুট রাখার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

৫.৪ পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের বিরোধিতা

নবীগণের দাওয়াহ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের নিজের পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া। দাওয়াহ শুরু হতো সাধারণত নিজেদের পরিবার-পরিজন থেকেই, কারণ তাদেরই কাছে প্রথমে সত্যের বার্তা পেশ করা হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আত্মীয়রাই নবীগণের আহ্বানকে অস্বীকার করত, বিদ্রূপ করত এবং অনেক সময় শত্রুতাও প্রদর্শন করত। এর প্রধান কারণ ছিল—তাওহীদের দাওয়াহ প্রচলিত বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, নেতৃত্ব ও স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিত। ফলে আত্মীয়রা পরিবর্তনকে গ্রহণ না করে প্রতিরোধের পথ বেছে নিত।

নবী নূহ (আ.)-এর পুত্র, ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা, লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়, মূসা (আ.)-এর পরিবারবর্গ এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর চাচা আবু লাহবসহ মক্কার নেতারা—এই বিরোধিতার উদাহরণ। তবুও নবীগণ ধৈর্য, কোমল আচরণ এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাদের দাওয়াহ চালিয়ে যান, যা তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সত্য প্রতিপাদনে অটলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৫.৫ সামাজিক বয়কট ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা

নবীগণের দাওয়াহের অন্যতম কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি ছিল সমাজের পক্ষ থেকে আরোপিত সামাজিক বয়কট ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। সত্যের আহ্বান যখন প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ, ক্ষমতা এবং প্রচলিত ধর্মীয় বা সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বিরোধী শক্তির নবী ও তাঁর অনুসারীদের দমাতে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করত।

ক. সামাজিক বয়কট

সামাজিক বয়কট বলতে বোঝায়—

- তাদের সাথে সালাম বিনিময় বন্ধ করা
- মেলামেশা, সাক্ষাৎ, আলোচনা পরিহার করা
- সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না করা
- তাদের সম্পর্কে অপবাদ ছড়ানো
- সমাজের চোখে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা

এই বয়কটের উদ্দেশ্য ছিল নবী ও তাঁর অনুসারীদের মানসিকভাবে দুর্বল করা, যাতে তারা দাওয়াহ থেকে সরে আসে। মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং বানু হাশিম গোত্রকে শিয়াবে আবি তালিবে তিন বছর ধরে যে কঠোর সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে রাখা হয়েছিল, তা এই বয়কটের সর্বাধিক পরিচিত উদাহরণ।

খ. অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ছিল সামাজিক বয়কটের আরও কঠোর রূপ, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল—

- তাঁদের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য না করা
- খাদ্য, পানি, বস্ত্র ও মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি নিষিদ্ধ করা
- কোনো আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ করা
- বাজারে যাওয়া বা পণ্য কেনা-বেচা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা

ফলে নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, নিষেধাজ্ঞার সময় মানুষ গাছের পাতা খেতে বাধ্য হতো।

একইভাবে, নবী ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াহ গ্রহণকারীদেরও সমাজ অর্থনৈতিকভাবে চাপে রাখার চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা পথ পরিবর্তনে বাধ্য হয়।

গ. পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়তার প্রকাশ

এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—দাওয়াহ বন্ধ করা। কিন্তু নবীগণ কঠোর ধৈর্য, ঈমানি দৃঢ়তা এবং সৌজন্যপূর্ণ আচরণ বজায় রেখে দাওয়াহ চালিয়ে যান। এসব নিষেধাজ্ঞা নবীগণের চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে ওঠে।

৫.৬ দাওয়াহ বিকৃত করার চেষ্টা ও মিথ্যা প্রচার

নবীগণের দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে বিরোধীরা সবসময় চেষ্টা করেছে তাঁদের বার্তা বিকৃত করতে এবং জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে। দাওয়াহের উদ্দেশ্য ছিল সত্য, তাওহীদ ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে সমাজকে পরিবর্তন করা; কিন্তু যারা ক্ষমতা, স্বার্থ, কুসংস্কার ও সামাজিক প্রভাব হারানোর আশঙ্কা করত, তারা সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা প্রচার এবং দাওয়াহ বিকৃত করার চেষ্টা চালিয়ে যেত।

ক. দাওয়াহের মূল বিষয় পরিবর্তন করে ভুল ধারণা তৈরি

বিরোধীরা দাওয়াহের বক্তব্যকে—

- বিকৃতভাবে উপস্থাপন করত
- কিছু অংশ লুকিয়ে রেখে অন্য অংশ অতিরঞ্জিত করত
- কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ছড়াত

এর লক্ষ্য ছিল—নবীগণ যেন জনগণের কাছে বিভ্রান্তিকর বা বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হন।

খ. নবীগণ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ ও গুজব ছড়ানো

বিরোধীরা প্রায়ই নবীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ করত যা তাঁদের চরিত্র ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আঘাত করত। যেমন—

- যাদুকর, মিথ্যাবাদী, পাগল, কবি — এমন উপাধি দেওয়া
- ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অপবাদ ছড়ানো
- অনুসারীদেরকে ভুল পথে প্ররোচিত বলে প্রচার করা

নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে কুরাইশ নেতারা কখনও “সাহির” (যাদুকর), কখনও “মাজনুন” (পাগল), কখনও “কাহিন” (যাজক) বলে বদনাম করত, যাতে তাঁর দাওয়াহ গ্রহণে মানুষ অনীহা প্রকাশ করে।

গ. মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ভয় দেখানো

যখন দাওয়াহ দ্রুত ছড়াতে থাকে, তখন বিরোধীরা সমাজকে ভয় দেখাতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে—

- বলা হত: “তার কথায় সমাজ ভেঙে যাবে”
- “নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে পূর্বপুরুষদের পথ হারাবে”
- “তার অনুসরণ করলে আর্থিক ক্ষতি হবে”
- “তার দাওয়াহ দেশ বা গোত্রের ঐক্য নষ্ট করবে”

এসব প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া যে সত্য গ্রহণ করলে তারা সামাজিক বিপদে পড়বে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবীগণের দাওয়াহ থেকে আধুনিক দাওয়াহর শিক্ষা

৬.১ নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

নবীগণের দাওয়াহ সবসময়ই ছিল মানবজাতির জন্য সার্বজনীন, ন্যায়ভিত্তিক এবং বিশ্বজনীন কল্যাণের আহ্বান। তারা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল, জাতি, ভাষা বা বংশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রেরিত হননি; বরং আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সমগ্র মানবসমাজকে তাওহীদ, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন— “আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে বলে—‘আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক।’” (সূরা নাহল, ১৬:৩৬) এই আয়াত প্রমাণ করে যে নবীগণের দাওয়াহ কোনো সংকীর্ণ পরিসর নয়; বরং এটি সমগ্র মানবসমাজের জন্য মুক্তি, সদাচার ও ঈমানের বার্তা বহন করে।

নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীনতার প্রথম দিক হলো মানবতার প্রতি সমান দয়া ও দায়িত্ববোধ। নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), ইবরাহিম (আ.), মূসা (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.)—প্রত্যেক নবী তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে একই মূল বার্তা দিয়েছেন: এক আল্লাহর ইবাদত করা, মানবিকতা রক্ষা করা, ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করা এবং অন্যায় ও শিরক থেকে দূরে থাকা। তাঁদের বার্তায় কোনো শ্রেণি বা জাতিগত বৈষম্য ছিল না; বরং দাওয়াহ ছিল নৈতিকতার ভিত্তিতে সবাইকে সমানভাবে সৎপথে আহ্বান করা। নবীগণের দাওয়াহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন দিক হলো সকল যুগ ও সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আদর্শ। দাওয়াহর শিক্ষায় সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, করুণা, সামাজিক দায়িত্ব—এসব মূল্যবোধ এমন যে তা যুগের পরিবর্তনেও কখনো অচল হয় না। ইবরাহিম (আ.)-এর তাওহীদের সংগ্রাম, মূসা (আ.)-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আহ্বান, ঈসা (আ.)-এর করুণা ও মানবিকতার শিক্ষা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবন—এসবই দাওয়াহর সার্বজনীনতার অখণ্ড প্রমাণ।

এছাড়া নবীগণের দাওয়াহর সার্বজনীনতা আরও প্রতিফলিত হয় মঙ্গল, শান্তি ও মুক্তির আহ্বানে। তাদের দাওয়াহ কোনো রাজনৈতিক দখল কিংবা জাতিগত আধিপত্যের উদ্দেশ্য বহন করেনি। বরং প্রতিটি নবী তাদের সমাজকে আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে প্রকৃত স্বাধীনতা, আত্মশুদ্ধি এবং অন্তরের প্রশান্তির দিকে আহ্বান করেছেন। কুরআন বলে— “হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে—অন্তরের রোগসমূহের আরোগ্য, হেদায়েত ও রহমত।” (সূরা ইউনুস, ১০:৫৭)

সর্বোপরি, নবীগণের দাওয়াহ সমাজ, জাতি, স্থান বা সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মানবতার জন্য একটি আলো। এটি এমন এক সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, সমাজকে সৎপথে চালিত করে এবং বিশ্বমানবতার মাঝে ন্যায়, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। নবীগণের এই সার্বজনীন দাওয়াহই আধুনিক দাওয়াহর জন্য পথনির্দেশক এবং অনুকরণীয় আদর্শ।

৬.২ আধুনিক সমাজে দাওয়াহর প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, বৈশ্বিকীকরণ, তথ্যপ্রবাহের সহজলভ্যতা এবং বহুমাত্রিক সামাজিক সংস্কৃতির প্রচারের ফলে মানবজীবন আজ নতুন চ্যালেঞ্জ ও জটিলতার মুখোমুখি। এমন পরিবেশে দাওয়াহর প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়; এটি মানবতার কল্যাণ, নৈতিকতা, শান্তি, ন্যায়বিচার ও সঠিক দিকনির্দেশনার প্রতি আহ্বান। আধুনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার-ব্যবস্থার দুর্বলতা, মূল্যবোধের সংকট, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাওয়াহ—যা মানুষকে আল্লাহর একত্ব, নৈতিক জীবনীশক্তি এবং মানবতার প্রতি দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়—এই সমস্যাগুলোর সমাধানে অপরিহার্য ভূমিকা রাখতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীর দাওয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক উপস্থাপন। কারণ আজকের মানুষ যুক্তি, প্রমাণ ও হৃদয়স্পর্শী আচরণ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তাই কুরআনের “উৎকৃষ্ট উপদেশ এবং উত্তম যুক্তি” (আন নাহল-১২৫) অনুসরণ করে জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াহ অপরিহার্য। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা দাওয়াহকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করার অসীম সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই উপকরণগুলো ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী শান্তি, সহনশীলতা, করুণা ও মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

অন্যদিকে বহুসাংস্কৃতিক সমাজে দাওয়াহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। নবীগণ যেমন তাদের জাতিকে ধৈর্য, দয়া, এবং সৌজন্যের সঙ্গে দাওয়াহ দিয়েছেন, তেমনই আজকের দাওয়াহর ক্ষেত্রেও নৈতিক চরিত্র ও আদর্শিক আচরণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা প্রয়োজন। কারণ দাওয়াহ কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং উত্তম চরিত্র, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে।

পরিশেষে, আধুনিক সমাজে দাওয়াহর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে সত্য, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা করা; যাতে

সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও পরস্পরের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়—এবং মানবজাতি আল্লাহর নির্দেশিত ন্যায় ও সত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

৬.৩ নবীদের আদর্শ অনুসারে দাওয়াহর আধুনিক কৌশল

নবীগণ তাঁদের দাওয়াহর ক্ষেত্রে যে নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সেগুলো যুগে যুগে দাওয়াহকারীদের জন্য আদর্শিক দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক যুগে একই আদর্শকে ভিত্তি করে দাওয়াহকে আরও কার্যকর ও সমন্বিতযোগ্য করার জন্য কিছু কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। প্রথমত, নবীগণের দাওয়াহে যেমন ছিল প্রজ্ঞা (*হিকমাহ*), যুক্তিনির্ভর উপস্থাপন ও নরম আচরণ, আজকের দাওয়াহেও সেটি অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও যুক্তিসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির এই যুগে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণ ও যুক্তির প্রতি সাড়া দেয়—তাই কুরআনের নির্দেশ “*হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান*” (আন নাহল-১২৫) অনুসরণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহ পরিচালনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, নবীগণ সর্বদা মানুষের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, ধৈর্য ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এই আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আধুনিক দাওয়াহকে মানবিক, কোমল ও চরিত্রভিত্তিক করা জরুরি। দাওয়াহ কেবল কথার মাধ্যমে নয়; বরং সত্যনিষ্ঠতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সেবা ও মানবিকতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতে হবে—কারণ নৈতিক আচরণই দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

তৃতীয়ত, নবীগণ তাঁদের দাওয়াহে যোগাযোগের উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করেছেন—কখনো সরাসরি, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। আধুনিক যুগে এর অনুকরণে সর্বাধুনিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও কন্টেন্ট, পডকাস্ট, অনলাইন আলোচনা এবং ডিজিটাল দাওয়াহ প্ল্যাটফর্মগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা দরকার। এগুলো দাওয়াহকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

চতুর্থত, নবীগণের দাওয়াহ সর্বদা ছিল প্রেক্ষাপট-উপযোগী। প্রতিটি জাতির মানসিকতা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাকে বিবেচনা করে তাঁরা কথা বলেছেন। আজও দাওয়াহ দিতে হলে শ্রোতার মানসিকতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, বয়স, শিক্ষাগত পটভূমি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বার্তা সাজানো জরুরি—এটি দাওয়াহকে কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী করে।

অবশেষে, নবীগণের দাওয়াহর সবচেয়ে মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহর উপর ভরসা, আন্তরিকতা ও লক্ষ্য-নিষ্ঠা। আধুনিক দাওয়াহকারীদেরও আত্মশুদ্ধি, নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা বজায় রাখতে হবে। কারণ দাওয়াহর প্রকৃত ফল আসে আল্লাহর সহায়তায়, আর সফল দাওয়াহকারীর চিহ্ন হলো আত্মিক দৃঢ়তা, নৈতিকতা ও অবিচল প্রচেষ্টা। এভাবে

নবীদের আদর্শ অনুসরণ করে আধুনিক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহকে আরও শক্তিশালী, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী করা সম্ভব।

৬.৪ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমভিত্তিক দাওয়াহর নতুন ধারা

আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের অগ্রগতির কারণে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে তথ্যের বিস্তার দ্রুত, সহজলভ্য ও বৈশ্বিক হয়েছে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় নবীদের দাওয়াহর মৌলিক আদর্শ—হিকমাহ, কোমলতা, মানবিকতা, ধৈর্য ও সত্যনিষ্ঠতা—অনুসরণ করে দাওয়াহকে নতুন প্রযুক্তিনির্ভর রূপে উপস্থাপন করা এখন সময়ের দাবি। নবীগণ তাঁদের যুগের উপলব্ধ যোগাযোগপদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন; আধুনিক সমাজে সেই আদর্শ অনুসরণ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও গণমাধ্যমকে দাওয়াহর শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, পডকাস্ট, ব্লগ, ওয়েবসাইট এবং অনলাইন লেকচার প্ল্যাটফর্মগুলোকে জ্ঞানসমৃদ্ধ, নৈতিক ও আকর্ষণীয় দাওয়াহ কন্টেন্ট তৈরির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। নবীদের দাওয়াহ যেমন ছিল যুক্তিসমৃদ্ধ ও হৃদয়স্পর্শী, তেমনই আজ প্রযুক্তিভিত্তিক দাওয়াহতে গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও অ্যানিমেশন, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন, গল্পভিত্তিক কন্টেন্ট এবং সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত ভিডিও ব্যবহার করে ইসলামের শিক্ষা আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরা যায়।

গণমাধ্যমভিত্তিক দাওয়াহর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পেশাদারিত্ব, সঠিক তথ্য যাচাই ও দায়িত্বশীলতা। নবীদের দাওয়াহে যেমন ছিল সত্য, সততা ও নির্ভুলতা—তেমনই অনলাইন দাওয়াহতেও ভ্রান্ত তথ্য, গুজব বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এড়িয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণ ভিত্তিক উপস্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভাষায় দাওয়াহ কন্টেন্ট তৈরি করে বহুভাষিক শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো যায়, যা নবীদের দাওয়াহর সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীন বার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারুয়াল দাওয়াহ প্রোগ্রাম, অনলাইন কোর্স, ই-লাইব্রেরি, ইসলামী মোবাইল অ্যাপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্ল্যাটফর্ম এবং শিক্ষামূলক গেমস দাওয়াহকে আরও সৃজনশীল ও গতিশীল করে তুলছে।

অবশেষে, প্রযুক্তিনির্ভর দাওয়াহর এই নতুন ধারা সফল হবে তখনই, যখন দাওয়াহকারীরা নবীদের মতো আন্তরিকতা, দয়া, নীতিনিষ্ঠতা ও আল্লাহর উপর ভরসা বজায় রাখবেন। প্রযুক্তি হলো মাধ্যম; আর নবীদের আদর্শ হলো দাওয়াহর প্রাণ—এ দুইয়ের সমন্বয়ে আধুনিক দাওয়াহ আরও মানবিক, বৈশ্বিক, যুক্তিনির্ভর ও সময়োপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

৬.৫ নবীগণের দাওয়াহ থেকে আহরণযোগ্য নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা

নবীগণের দাওয়াহ শুধু ঈমান ও তাওহীদের আহ্বানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এতে নিহিত ছিল গভীর নৈতিকতা, মানবিকতা, চরিত্রগঠন এবং সমাজসংশোধনের শিক্ষা। তাঁদের দাওয়াহর প্রতিটি ধাপেই দেখা যায় সত্যনিষ্ঠা, পরিষ্কার-সুশৃঙ্খল আচরণ, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতার পূর্ণ প্রকাশ। নবীরা তাঁদের জাতির কাছে তাওহীদ প্রচারের পাশাপাশি শিখিয়েছেন—মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি, সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার ও শোষণ থেকে বিরত থাকা, এবং প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। নবী নূহ (আ.)-এর অবিচল ধৈর্য, হুদ (আ.) ও সালেহ (আ.)-এর জাতিকে সতর্ক করার আন্তরিকতা, ইবরাহিম (আ.)-এর নম্র যুক্তিনিষ্ঠা, মূসা (আ.)-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসিক অবস্থান, ঈসা (আ.)-এর দয়া ও মানবিকতার শিক্ষা—এসবই দাওয়াহর নৈতিক দিককে সমৃদ্ধ করে। একইভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দাওয়াহে সর্বোচ্চ নৈতিক মানের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁর দাওয়াহ প্রমাণ করে সত্য কথা বলার সাহস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান, শত্রুকে ক্ষমা করা, প্রতিদানে উত্তম আচরণ করা, পরিবার ও সমাজে সম্মান বজায় রাখা এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে লক্ষ্য করা একজন দাঈর সর্বোত্তম চরিত্র।

নবীগণের দাওয়াহ থেকে আমরা শিখি—দাওয়াহ কখনো ঘৃণা, কঠোরতা বা বিদ্বেষের মাধ্যমে নয়; বরং ভালোবাসা, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার মাধ্যমেই মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে। তাঁদের শিক্ষা বর্তমান যুগের দাওয়াহকারীদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন দাঈর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, নীতি, সততা ও মানবিকতা—এই সবই তার কথার চেয়ে বেশি প্রভাব রাখে। তাই নবীদের আদর্শ অনুসরণ করে দাওয়াহকে হতে হবে প্রজ্ঞাশীল, নৈতিকতানিষ্ঠ, মানবিক এবং কল্যাণমুখী—যা মানুষকে শুধু ইসলামের দিকে আহ্বানই করবে না, বরং সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সদাচরণের পরিবেশও সৃষ্টি করবে।

উপসংহার

নবীগণের দাওয়াহ ছিল মানবতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হিদায়াতের আলো—যা মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। ইতিহাস ও ওহীর প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে প্রতিটি নবী একই মূল বার্তা—তাওহীদ, সৎকর্ম, ন্যায়নীতি এবং নৈতিক উন্নতির প্রতি আহ্বান—অটল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। বিরোধিতা, সামাজিক বয়কট, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, প্রচারণা যুদ্ধ বা শারীরিক নির্যাতন—কোনো বাধাই তাদের দাওয়াহকে থামাতে পারেনি।

নবীগণের দাওয়াহ পদ্ধতি ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ, নরম আচরণভিত্তিক, যুক্তিনিষ্ঠ ও গভীরভাবে মানবিক। তারা প্রথমে নিজেদের পরিবার ও নিকটজনদেরকে দাওয়াহ দিয়েছেন, সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে সম্মান দিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় থেকেছেন এবং সত্যের পথে অটল থেকেছেন। মিথ্যা প্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার মুখেও তারা সত্যকে বিকৃত হতে দেননি; বরং আদর্শ চরিত্র ও পবিত্র আচরণের মাধ্যমে দাওয়াহর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অতএব, নবীগণের দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বানই নয়—এটি ছিল নৈতিক বিপ্লব, সামাজিক সংস্কার, মানবমুক্তি এবং অন্তর্নিহিত আত্মশুদ্ধির পথ। তাদের কর্মপদ্ধতি আজও দাওয়াতকারীদের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ: ধৈর্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা এবং মানবিক আচরণ। এই আদর্শই প্রমাণ করে যে সত্য দাওয়াহ কখনো শক্তি বা জোরজবরদস্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান, চরিত্র ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে।